International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IV, Issue-III, November 2017, Page No. 10-17
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী বাংলা নাটকে প্রতিবাদ : মন্মথ রায়ের 'কারাগার'

ড. অনিল বিশ্বাস
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

It is right to say that there is no consistency of Bengali theatre trend of post-world war- I with its previous trend. In thirties of nineteenth century a new trend was introduced by Kallol group. They revealed the mystery of critical human behaviour and biological relation as well as nature of desire of human being. People's belief was shaken up by evolution theory of Charles Darwin and Aldus Huxley's invention about bio-science. Similarly Freud's theory of human nature and Marx-Engels' theory of socialism also stunned the people. Simultaneously world-wide economic depression which greatly pressurized the Indian economy and also the Bengali theatre in between the world wars.
Manmatha Roy established the modern dramatic dialect in the structure of mythological drama. He tried to build the feelings of agony of dependence in his plays. His sensitivity of writings succeeded to touch the heart of Bengal. His famous play "Karagar" was first performed in 24th December of 1930 at Manmohan Theatre, Kolkata. The audience was so much moved by the fact of the said play, that they raised the slogan of "Vande Mataram" as the mark of nationality. This incident established the efficiency of Manmatha Roy to knock the people through his play. Girish Chandra Ghosh, the famous playwright, had its own theatrical trend before the world war-I, as we get another very new trend in the writings of Bijan Bhattacharya which called "Gananatya" during the world-war II. These two trends are very different in nature. Manmatha Roy drew a linkage line between these very different trend.

Article DOI: 10.29032/IJHSSS.v4.i3.2017.1-10

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গান্ধিজির আগমন একটি যুগান্তকারী ঘটনা। জাতির জীবনে গান্ধিজির প্রভাব সর্বব্যাপ্ত---সর্বত্রগামী---জনগণের হৃদয় হরণকারী। সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি দেশের সমস্ত বিষয়ই গান্ধিময়। তাঁর আগমনে বহুমুখী আন্দোলন নতুন রূপ পেল। বাংলাদেশও এর প্রভাবের থেকে বাইরে থাকেনি। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে গান্ধিজির সংগ্রাম ছিল প্রকাশ্য। জনতার ঐক্যবদ্ধ শক্তির দৃঢ়তার উপরই আস্থাবান ছিলেন গান্ধিজি।

> *"চম্পারণে নীলচাষী, গুজরাটের খেড়ো জেলায় অজন্মাপীড়িত জনগণের কর লাঘব এবং আমেদাবাদের শ্রমিকদের দাবি আদায় নিয়ে অহিংসা সত্যাগ্রহ অভিযানের সাফল্য তাকে জনশক্তি সম্বন্ধে অবহিত করল।*

বিপ্লবের প্রকৃত বীজ যে জনশক্তির মধ্যে নিহিত এই উপলব্ধি সমগ্র কর্মপন্থার মধ্যে আনল এক নতুন জোয়ার।"[১]

মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের মধ্য থেকে বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সাধারণ মানুষের সীমানায় হাজির করলেন। সাধারণ মানুষও দেশকে নিজের দেশ বলে ভাবতে পারল। জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত জনগণের কাছে দেশপ্রেম বড় হয়ে উঠল। জনশক্তির অভ্যুত্থান রাজনৈতিক আন্দোলনকে এক নতুন মাত্রা প্রদান করল। তাইতো বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনের সঙ্গে ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপকতার ফারাক চোখে পড়ার মত।

"মেদিনীপুরের চাষীরা পুলিশের লাঠি খেয়েও সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব দিল না। রায়বেরিলি ও ফৈজাবাদের রায়তরা অন্যায় সেসের প্রতিবাদে জমিদার ও পুলিশের লাঠি ঠেকাল। ছোটনাগপুরের আদিবাসীরা বন্ধ করল চৌকিদারী ট্যাকস। জাতীয় আন্দোলনের তরঙ্গে আন্দোলিত সবাই।"[২]

গান্ধির এই সংগ্রামী ভাবমূর্তি মন্মথ রায়ের কারাগার নাটকের বাসুদেব চরিত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়াও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে দেশময় আন্দোলনে সমাজের নীচের তলার মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগল। বাংলার নাট্য জগতে এল জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'মন্দির প্রবেশ' অথবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য। আবার নারীমুক্তি আন্দোলন নারীকে ক্ষুদ্র গৃহকোণ থেকে মুক্ত করল রণাঙ্গনে।

প্রথম বশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের চিন্তনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করল। যুক্তিবাদী চিন্তনের প্রবণতা পূর্বের সমস্ত সংস্কার-বিশ্বাস ও প্রথানুগতিক ধারণার বিরুদ্ধে প্রশ্ন চিহ্ন নিয়ে এল। একদিকে পাভলভ, অয়াডলার, ফ্রেড প্রমুখের মানব প্রকৃতির বিশ্লেষণ অপর দিকে মার্ক্স-এঙ্গেলসের সাম্যবাদী আন্দোলনের ঢেউ। মুখ্যত এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী বাংলা নাটক আন্দোলিত হয়েছে-এর সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা যা ভারত তথা বাংলাকেও স্পর্শ করেছিল স্বাভাবিক ভাবেই।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই মানবেন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে সাম্যবাদ বিস্তারের চেষ্টা আরম্ভ হয়। বাস্তবিক পক্ষে গান্ধিবাদী এবং সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রতিস্পর্ধী শক্তি রুপে এর উত্থান। শ্রমিক ধর্মঘট এবং শ্রমিকের দাবি আদায়ের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছিল। যদিও তাঁরা তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে কোনো শ্রেণি-সংগ্রামের ধারণা সৃষ্টি করতে পারেনি, তবু বলতেই হবে সারা ভারতে শোষণমুক্ত সমাজগঠনের স্বপ্ন সৃষ্টি করেতে তাঁরা পেরেছিলেন।

বাংলা নাট্য ধারার সঙ্গে যুদ্ধ পরবর্তী নাট্য ধারার কোন ধারাবাহিকতা নেই। মোটামুটি ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত পূর্বের কর্মকান্ড প্রসারিত ছিল ধরা যায়। তিনের দশকে কল্লোল গোষ্ঠীর হাত ধরে নরনারীর জৈব-সম্পর্ক ও কামনার স্বরূপ এবং গভীর গোপন মনের জটিল আচরণের মনস্তাত্বিক রহস্য উন্মোচন করেছেন। ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও হাক্সালীর জীববিজ্ঞান সম্পর্কিত আবিষ্কার মানুষের সংস্কার ও প্রত্যয়ের মূলে নাড়া দেয়। তাই ডঃ দীপক চন্দ্র যর্থার্থই বলেছেন—

"স্বাধীনতাকামী জাতির প্রকৃত মুক্তযুদ্ধের রণদামামা বেজেছে যুদ্ধোত্তর বাংলা নাটকে। এই সময়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কার্যকারণ সূত্রগুলির সংগে অন্বিত হয়ে নাট্যকারদের দেশাত্মবোধ ও ঐতিহাসিক সত্যান্বেষা অভিনন্দিত হয়ে দেখা দিয়েছে। জাতীয় অভ্যুত্থান এবং বিদ্রোহের পাঞ্চজন্যে বাংলা নাটক দশদিক মুখরিত। তাঁর শক্তির মহত্ত্বের উৎসটি নিহিত ছিল সন্ত্রাসবাদী ও অসহযোগী আন্দোলনকারীদের স্বার্থত্যাগ, আত্মবিসর্জন, আদর্শনিষ্ঠা এবং কঠিন দুঃখ বরণের মধ্যে। প্রাকযুদ্ধে রচিত নাটকগুলির মতো জাতীয় উন্মাদনা এখানে রোমান্টিক ভাবাবেগ দ্বারা দুর্বল নয়, সংগ্রামী মানুষের আত্মবোধের দ্বারা আলোড়িত। নাটকের আঙ্গিক এবং উপস্থাপনের মধ্যে তাই এসেছে পরিবর্তন।

রাজনৈতিক, সমাজনীতি, অর্থনীতি এবং মানব প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাটকে জাতীয়তাবোধের প্রকাশ। এর ফলে, নাট্যকারের বিশ্লেষণাত্মক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। ভাবাবেগের সঙ্গে দিয়েছেন চিন্তা ও আত্মসমালোচনার উপহার। এ ছাড়া একালের সব নাট্যকারই গণশক্তির প্রতি অতিমাত্রায় আস্থাবান। অসহযোগ আন্দোলন যে সমাজতন্ত্রী নাট্যচেতনার কর্মপথ প্রস্তুত করল প্রতিক্রিয়াপন্থী ব্রিটিশ রাজতন্ত্র সেই বিক্ষুব্ধ সমাজচেতনাকে যতই দমন করতে চেষ্টা করে 'জনবাদী ভাবনা' ততই নাট্যকারদের অধীর করে। তাঁদের সমগ্র চিন্তা ভাবনা ছিল জনজীবনের দিকেই। জনগণের সঙ্গে একাত্মতার সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে একালের বহু নাটক সরকারি আদেশনামায় নিষিদ্ধ হল।"[৩]

বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে আমরা দুজনের কথা আলোচনা করতে পারি-একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অপরজন-মন্মথ রায়।

ইউরোপে নব যুগের দিক-নির্দেশক নাট্যকার হেনরিক ইবসেন-এর মতই বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাও আমরা ভুলতে পারিনা। সমসাময়িক কালে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথই যে বিশ্বদরবারে উপস্থাপনযোগ্য নাটক রচনা করেছিলেন, একথা যেমন স্বীকার করতেই হবে, তেমনি একথাও মেনে নিতে হয় যে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ও তৎপরিবেষ্টিত নাট্যজগতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল খুবই ক্ষীণ। তাঁর দু'একটি প্রহসন জনপ্রিয় হলেও তিনি মঞ্চ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি।

নাট্যকার মন্মথ রায় একাঙ্ক নাটকের সৃষ্টিকর্তা হিসাবেই বেশি পরিচিত হলেও পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনাতেও তিনি যথেষ্ট মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন। গিরিশ ধারার উত্তর সাধক অপরেশচন্দ্রের সময়কালেই পৌরাণিক নাটককে ধর্মভাবাশ্রিত ভিত্তির তারল্য থেকে মুক্ত করে জনচেতনার সূত্রটি যেন সামনে নিয়ে এসেছিলেন। এমনিতেই সমকালের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব, স্বদেশী আন্দোলন ইত্যাদির সঙ্গে মন্মথ রায়ের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নাটকে মানবিক চেতনা ও প্রতিবাদী চিন্তার প্রকাশ দেখা দিয়েছিল।

আধুনিক নাট্যসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য-চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব। যে কোন চরিত্রই শুধুমাত্র ভালো অথবা শুধুমাত্র মন্দ হতে পারে না (The devil is not as black as he is painted.)[৪] পুরাণ-মহাকাব্য ইত্যাদিতে যে চরিত্রগুলো ঘৃণার পাত্র ছিল, আধুনিক চেতনার বিকাশে সে সকল চরিত্র ও সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত হয়ে মনুষ্যত্ববোধের এক নব পরিচয় দর্শকের সামনে নিয়ে এল। যুক্তিবাদী বিচারশক্তি জনমনে ক্রমে ক্রমে অধ্যাত্মবিমুখ ও বাস্তবসম্মতি চিন্তা-চেতনার জন্ম দিল। বাংলা পৌরাণিক নাটকে ভক্তিভাব ও ধর্মাদর্শের সুতীব্র ভাবাবেগের জায়গায় স্থান করে নিতে লাগল ঘাত-প্রতিঘাতময় দ্বন্দ্ব, যা গতানুগতিক ধর্ম ও নীতিশিক্ষার উপাদানকে দূরে সরিয়ে নাটকীয় রস সৃষ্টিকে তরান্বিত করল। নাট্যতত্ত্বের বিচারে যা আধুনিক পৌরাণিক নাটকের মান বৃদ্ধি করেছে একথা বলাই বাহুল্য।

মন্মথ রায় পৌরাণিক নাটকের ভক্তিরসটিকে পটভূমিকায় রেখে-সমকালীন জীবন যন্ত্রণা ও স্বদেশ প্রেমকেই সামনে নিয়ে এসেছেন। তাঁর 'চাঁদ সদাগর'-এ যেমন বাঙালি বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশ ঘটল, তেমনি মানবিক চেতনায় সমৃদ্ধ হল-'দেবাসুর', 'সতী', 'সাবিত্রী', 'কারাগার', ইত্যাদি নাটক। নাটক সম্পর্কে নিজের শিল্পভাবনাকে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন—

"প্রত্যেক নাটক-নাটিকারই থাকে একটি বক্তব্য। প্রকাশ্যেই হ'ক আর প্রচ্ছন্নই হ'ক। কিন্তু সে বক্তব্য আজ যেন সমাজতান্ত্রিক সুরে বাঁধা হয়, আর তাতেই তা হবে জীবনধর্মী। সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করে আমাদের সুস্থভাবে বাঁচতে হলে, জগৎসভায় আসন নিতে হলে, সমাজতন্ত্রের আশু প্রতিষ্ঠা ভিন্ন আর কোনো পথ নেই। এতে যত বিলম্ব হবে, জীবন যন্ত্রণা তত বাড়বে।...নাটক আর বিলাস নয় আত্মরক্ষার হাতিয়ার।"[৫]

নাট্যকার মন্মথ রায় গিরিশ ও বীজন-এর মধ্যবর্তী সময়ের একজন অসামান্য নাট্যকার। তাঁর শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক 'কারাগার' (১৯৩০)। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা এই নাটকটির বিষয়েই আলোচনা করব। প্রথমেই নাটকটির মূল পৌরাণিক কাহিনির বিষয়টি সামনে আনতে পারি। ভগবতের নবম স্কন্ধ থেকে জানা যায় বসুদেবের পিতা যদুবংশীয় শূরসেনকে পরাজিত করে ভোজবংশীয় নৃপতি আহুকের পুত্র উগ্রসেন মথুরার সিংহাসন দখল করেন। এই উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র হল কংস (সৌভপতি দানব দ্রুমিল উগ্রসেনের রূপ ধরে উগ্রসেনের পত্নীর উপগত হন)। এই কংসই উগ্রসেনকে বন্দি করে মথুরার সিংহাসনে বসেন। আবার শূরসেনের পুত্র বসুদেব উগ্রসেনের ভাই দেবকের কন্যা দেবকীকে বিয়ে করলে দৈববাণী হয়, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কংসকে বধ করবে। দৈববাণী শুনে কংস দেবকীকে হত্যা করতে গেলে বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে বন্দী করে রাখেন। নারদ এসে খবর দেয় দেবকীর গর্ভে স্বয়ং নারায়ণ জন্মগ্রহণ করে কংসকে হত্যা করবে। তাতে কংস তাঁর অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের হাতেই কংসের নিধন হয়।

'হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম, মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।' গিরিশচন্দ্রের এই বাণীকে নাট্যকার মন্মথ রায় যেমন ভুলতে পারেননি, তেমনি নাটকের জীবনধর্মীতার কথাও তিনি সামনে না এনে পারেন নি। দর্শকেরা যে শুধু দর্শক নয়, তারাও দেশের মানুষ। তাই পরাধীন ভারতর্ষের সমস্যা তাঁর নাট্যমধ্যে স্থান করে নিয়েছে। তাইতো পৌরাণিক নাটকের কাঠামোর মধ্যেই আধুনিক নাট্য বিষয়ের স্থাপনা করে-এক দিকে তিনি বাঙালির মনের পরশ নিতে চেষ্টা করেছেন, অপরদিকে পরাধীন ভারতবর্ষের চেতনা জাগ্রত করার কথাও ভেবেছেন। আর সে চেষ্টা যে সফল হয়েছিল, তা বোঝা যায়, যখন রাজশক্তির শূল দৃষ্টিতে নাটকটি ক্ষতবিক্ষত হয়।

১২ই মার্চ ১৯৩০, আমেদাবাদ-এর সবরমতী থেকে ২৫০ মেইল পায়ে হেঁটে গান্ধিজী- ডাণ্ডিতে পৌছে লবণ আইন ভাঙেন ও সত্যাগ্রহ শুরু করেন। ৫ই মে, ১৯৩০ গান্ধিজী গ্রেপ্তার হলে সারা দেশে আইন অসাম্য ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। দেশের ছোট বড় সকল নেতাকেই জেলে পোরা হতে লাগল। এই বিশিষ্টদের কারাবন্দি করার ফলে জেল (কারাগার) যেন হয়ে উঠল তীর্থক্ষেত্র। পৌরাণিকতার রুপকে মন্মথ রায় লিখেলেন রাজনৈতিক নাটক 'কারাগার।' পৌরাণিক ভক্তির আকুলতা কোথায় যেন দেশপ্রেমের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল। মন্মথ রায় বর্তমান ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপস্থাপনে যে পৌরাণিক ঘটনার অবতারণা করেছিলেন তা যে সফল হয়েছে, তা স্পষ্ট রূপে বোঝা গেল ২৪ শে ডিসেম্বর, ১৯৩০, মনমোহন থিয়েটারে নাটকটির প্রথম রজনীর অভিনয় সাফল্যে- নাট্যশালা মুখরিত হয়ে ওঠে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে। একথা বাঙালি দর্শক যতটা না বুঝেছিল, তাঁর শতগুণ বুঝেছিলেন শাসক ইংরেজ। তথ্য বলেছে-ফোর্ট উইলিয়াম থেকে গোরা সৈন্য পাঠিয়ে নাটকটি সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া হয়। শঙ্কিত বৃটিশ রাজ ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১ নাটকটি নিষিদ্ধ করে 'Order' জারি করে। 'Order' টিতে অভিযোগ হিসাবে বলা হয়—

> *"...The play entitled 'Karagar' by Manmatha Roy..., Is likely to excite feelings of disaffection towards the Government established by law in British India"*[৬]

আবার ৫ই মার্চ ১৯৩১-এ পুনরায় অভিযোগ করা হয়—

> *"The home Member added that ostensibly the play did not relate to present-day politics, but actually its bearing on present day politics was beyond doubt."*[৭]

সরাসরি নাটকটিকে ধরতে না পেরে যেন তেন প্রকারেন নাটকটিকে বন্ধ করার যে দায় বৃটিশ সরকারের পড়ে ছিল, সেটাই এই নাটকের স্বদেশ প্রেমমূলক নাটক হয়ে উঠবার সবচেয়ে বড় শংসাপত্র। এখানে আমরা সে সম্পর্কিত কয়েকটি নাট্য সংলাপ– চিত্র তুলে ধরতে পারি।

বৃটিশের জেল-এখানে হয়েছে কারাগার। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এই জেলে বন্দী করে চরম নির্যাতন করা হত। অত্যাচারিত বসুদেব যাদবদের জাগাবার জন্য—

> *'যে অত্যাচার সহ্য করে, মৃত্যু তাকে ঘৃণা করে। মৃত্যু তাকে পদাঘাত করে' পরশ দেয়, মৃত্যু যন্ত্রণা দেয়, কিন্তু আলিঙ্গন দিয়ে মুক্তি দেয় না-শান্তি দেয় না'—*

(প্রথম অঙ্ক)- একথা বলে অত্যাচারিতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ডাক দেন। একই ভাবে নিজের রাজত্ব পুনরুদ্ধার করার অঙ্গীকার একাকার হয়ে যায় দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে—

> *'সেই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ওই রাজমুকুট অর্জন করব..ভিক্ষা করে নয়, দান গ্রহণেও নয়।"-এ সংলাপ পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের বীরদর্প ঘোষণা। অত্যাচারিত ভয়ার্ত মানুষের জাগিয়ে তোলবার কথাও এখানে বলা হয়েছে "এরা ঘুমিয়ে আছে...জাগাতে হবে।' (তৃতীয় অঙ্ক)*

আর এই তৃতীয় অঙ্কে কঙ্কণের শেষ সংলাপ যেন বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

> *'হে শয়তান, ভাবছ কেমন করে আমি বাঁচলাম? শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠবে। তোমার এই নরকে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্টার জন্য আমরা ভগবতী মাতা মুমূর্ষু দুধের শিশু ঐ রঞ্জনকে তাঁর স্তন্য হতে বঞ্চিত করে, সেই স্তন্যের শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত আমাকে পান করিয়ে, ঐ শিশু দধীচি রঞ্জনকে নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। আজ আমি শুধু বেঁচে নাই, আজ আমি পাহাড় চূর্ণ করতে পারি। ... মাতৃস্তন্যের অমোঘ শক্তি আমার বাহুতে। এই বাহুতে বহন করি জাগ্রত ভগবান প্রতিষ্টা করব দেবকী-ক্রোড়ে, কংস-কারাগারে। (কংসের প্রতি) শয়তান সাধ্য থাকে বাঁধা দাও।'*

নারী জাগরণের বিষয়টিও যেন বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দেবকী বলেছে,

> *"সশস্ত্র যখন সশস্ত্রের উপর অত্যাচার করে, ভগবান তখন জাগেন না, ভগবান জাগেন তখন যখন সশস্ত্র নিরস্ত্রের উপর অত্যাচার করে।"*

একের পর এক সন্তানের মৃত্যুতেও তাঁর বিশ্বাস অটল, শত দুঃখের মধ্যেও লক্ষ্যে সে ছিল অবিচল। আবার

> *'কঙ্কন ও কঙ্কা-সোল্লাসে নিজেরাই লৌহ-শৃঙ্খল হাতে তুলিয়া লইয়া গাহিল-আজ শৃঙ্খলে বাজিছে মাভৈ বরাভয়'*

নারী শক্তির এই জাগরণ বৃটিশ ভালো চোখে দেখতে পারেনি। তাইতো কংসের মতই বংসকামী ভীত মন নিয়ে মহান ইংরেজ কারাগার নাটকটিকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে।

কংসের উৎপীড়নে ভীত যাদব, অনুতপ্ত উগ্রসেন যিনি বসুদেবকে রাজমুকুট ফিরিয়ে দিতে চান, কংস অনুচর নরক ও বিদূরথের সেই রাজমুকুট কেড়ে নিয়ে পলায়ন, কংসের উৎপীড়নের চেহারা আর তাঁর বিপরীতে বসুদেবের ঘোষণা—

> *'আমার শক্তিসাধনা করছি, সেই শক্তি যা এই অত্যাচার উৎপীড়ন দমন করতে পারে.. যা আমাদের হৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে পারে। সেই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ঐ রাজদণ্ড, ঐ রাজমুকুট অর্জন করব... ভিক্ষা করে নয়, দান গ্রহণেও নয়।' (প্রথম অঙ্ক)*

উগ্রসেন যে শালগ্রাম শিলা পূজা করতেন কংস সেটিকে চূর্ণ করতে চান। কিন্তু উগ্রসেন চাইলেও কংস সেটিকে ধ্বংস করতে পারে না, তাঁর চিত্তে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। অকুতোভয় কঙ্কা ও কঙ্কণের লৌহ শৃঙ্খল ধারণ। এই দৃশ্যেই

কঙ্ক ও কঙ্কণের বীরত্বময় মৃত্যু। কংসদাস বিদূরথ বাইরে প্রভুভক্তি প্রদর্শন করলেও ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়েছেন।

'বিদূরথ।। হ্যাঁ মারা গেছে। তাকে নিজের হাতে পুড়িয়ে এলাম।
পুড়িয়ে তাঁর সব কটি ছাই তুলে নিলাম, শ্মশানে ছড়িয়েছি। ওখানে ছড়িয়েছি, ঘরে ঘরে বিলিয়ে এসেছি।তারাও ছড়াবে বলেছে। কি হবে জান?
নরক।। কি?
বিদূরথ।। সেই ছাই থেকে আবার উঠবে...
নরক।। কে?
বিদূরথ।। আমার খোকা। শুধু কি খোকা? আমার খোকার মতো হাজার হাজার লাখ লাখ লোহার খোকা।'

বিদূরথের এই সংলাপ আশাবাদে উদ্দীপিত করেছে, সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীকে।

শেষ অঙ্কে একদিকে দুঃস্বপ্ন ব্যর্থ করে নিয়তির শেষ বাঁধা অতিক্রম করে কংস নবজীবন লাভের আশায় বিভোর, অপরদিকে ঘোর দুর্যোগের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। নিজের তৈরি পাষাণ কারাগারের দ্বার আজ কংস নিজেই খুলতে পারছে না। দেবকীর সন্তান যোগমায়াকে (আসলে যশোদা কন্যা) পাষাণে নিক্ষেপ। নিমিষে 'উর্দ্ধে অষ্টভূজা মহামায়া মূর্তির' আবির্ভাব। এই সমস্ত ঘনঘটার মধ্যে কংসের ঘোষণা—

'হ্যাঁ, আমি, এই দুর্বৃত্ত এই নারকী? কত যুগ যুগ ধরেই তো কত কোটি কোটি লোক কত পূজা করেছে...কত তপস্যা করেছে.. তাতে স্বর্গের আসন একতিলও টলেনি। চোখ বুজে সইতে পারিনা ...আমি তাই অত্যাচারে অত্যাচারে তাকে জর্জরিত করে স্বর্গ থেকে আমার এই মর্ত্যেই টেনে এনেছি...'

পৌরাণিক নাটকে ধর্মের জয় যেমন হয়েছে, তেমনি- 'অবতার মিথ' এর সার্থক রূপায়নও হয়েছে, অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত মুক্তি পেয়েছে। সর্বজন হিত্য সর্বজন সুখায়-এই আপ্তবাক্য নাট্য সমাপ্তিতে সার্থক হয়েছে।
অনুতাপের আগুনে দগ্ধ উগ্রসেনের উন্মাদপ্রায় সংলাপ নাটকের পরিমণ্ডলটিকে ভারি করে তোলে। বসুদেব ও উগ্রসেনের সংলাপ—

উগ্রসেন।। অথচ...এই অত্যাচার...এই অনাচার আমারই নামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে...উৎপীড়িত নরনারী আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে.. অথচ অথচ... আমি এর জন্য এতটুকু দায়ি নই।

বাসুদেব।। তথাপি আপনি আপনি রাজা...প্রজার ওপর অপরের অত্যাচারের জন্যও রাজাই দায়ী।

উগ্রসেন।। ধিক এরূপ রাজত্বে। বসুদেব, এই নাও রাজদণ্ড...এই নাও রাজমুকুট। অত্যাচারীকে দমন কর... রাজ্যের ক্রন্দন নিবারণ কর...আমার বিবেক তুষানলে দগ্ধ হচ্ছে.. তোমার রাজত্ব তুমি গ্রহণ কর...আমাকে মুক্তি দাও...আমকে রক্ষা কর। (প্রথম দৃশ্য)

এই দৃশ্যেই বসুদেবের চরিত্রের ঋজুতার পরিচয়ও প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে—

বাসুদেব।। এ দান গ্রহণে আমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। আমি জানি, দান গ্রহণে কখনো স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না। আমরা রাজচ্যুত...অত্যাচারিত...উৎপীড়ত কিন্তু...ভিক্ষুক নই। আমাদের কোন আবেদন নাই-নিবেদন নাই। আমরা শক্তিসাধনা করছি...সেই শক্তি...যা এই অত্যাচার-উৎপীড়ন দমন করতে পারে...যা আমাদের হৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে পারে। সেই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ঐ রাজদণ্ড, ঐ রাজমুকুট অর্জন করবে... ভিক্ষা করে নয়, দান গ্রহণেও নয়। (প্রথম দৃশ্য)

বিদূরথ যাদব হয়েও কংসের প্রতি একনিষ্ঠ। প্রভুভক্তির বিপরীতে পুত্রস্নেহ- একদিকে কর্তব্য অপরদিকে বাৎসল্য বিদূরথ চরিত্রটিকে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। নাট্যমধ্যে বিদূরথের সংলাপই তাই যেন অত্যাচারী বিনাশের আশাবাদ শোনায়।

বিদূরথ।। আমার খোকা। শুধু কি খোকা? আমার খোকার মতো হাজার হাজার লাখ লাখ লোহার খোকা। তাঁরা কি করবে জান? (নরক নীরবেই রহিল) এবার ওরা যা পায়নি, সেবার তাঁরা নিতে আসবে। এক ফোঁটা জল পায়নি... এক ফোঁটা দুধ পায়নি... এক মুঠো ভাত পায়নি। এবার ওরা এসে প্রথমেই বলবে - আগে চাই সুদ, তারপর চাই আসল।

কঙ্কা ও কঙ্কণ চরিত্র দুটি যেন একে অপরের পরিপূরক। একজন মন্দিরের করঙ্ক-বাহিনী, অপরজন কংসের সেনানায়ক ও কংসদাস বিদূরথের পুত্র। এদের নিয়ে একটি উপকাহিনি তৈরি হয়েছে যা মূল কাহিনিকে গতি দান করেছে। এই দুটি চরিত্রের উপর কংসের বিধির অত্যাচার যেমন পাঠক দর্শককে শিহরিত করে তেমনি এদের বিশ্বাস, বীরত্ব, আত্মসম্মান বোধ ও শৃঙ্খল মুক্তির জন্য চরম আত্মত্যাগ স্বাধীনতাকামী পরাধীন দেশবাসীর মনে সংগ্রামী মনোভাবের উদ্বোধনও ঘটায়। কঙ্কা ও কঙ্কণের সংলাপের ছত্রে ছত্রে পাঠক আপ্লুত হয়, উজ্জীবিত হয়। তাই বলা যায়— এদের সংলাপ যেমন চরিত্রের অনুগামী হয়েছে, তেমনি নাটকের মূল দ্বন্দ্বটিকে গতিদান করে সার্থক করে তুলেছে। আমরা চতুর্থ অঙ্কের কিছুটা অংশ উদ্বৃত করতে পারি—

কংস।। বিকার বেড়েই চলেছে নরক। তবে আর এক মাত্রা—
নরক।। হ্যাঁ, যেমন রোগ তেমনি ঔষধ হওয়া চাই—
কংস।। এখন বল—
নরক।। দাসত্ব স্বীকার কর কিনা—
কঙ্কা।। কখনো না - কখনো না—
কঙ্কণ।। দাসত্বের প্রস্তাবে আমি পদাঘাত করি—
কংস।। নরক, ঔষধের তবে দ্বিতীয় মাত্রা - (নরকের প্রস্তান)
কঙ্কণ।। চক্ষের সম্মুখে দাওনবের... রাক্ষসের এই অসহনীয় পৈশাচিক অত্যাচার... এক দুর্বলা নারীর ওপর... যে নারী ওপর... যে নারী আমাকে চিরতরে দাসত্ব-শৃঙ্খল হতে মুক্ত করেছে, সে মুক্তি যদি সত্য হয়, তবে মিথ্যা-মিথ্যা-মিথ্যা এই লৌহ শৃঙ্খল (শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিল) কোথায় কঙ্কা - কোথায় কঙ্কা—

(ছুটিয়া কঙ্কার প্রবেশ। হাতে তাঁর যবণী প্রহরিণীর ছুরিকা)

কঙ্কা।। আমি এসেছি—
কঙ্কণ।। ওরা তোমার অঙ্গুলির পর অঙ্গুলি কেটে আমায় ওদের দাসত্ব বরণ করতে বাধ্য করবে স্থির করেছে, কিন্তু জানেনা ওরা—
কঙ্কা।। যে সে অঙ্গুলি আমি স্বেচ্ছায় দিতে পারি—(নিজের অঙ্গুলি কাটিতে কাটিতে) অঙ্গুলি কেন, মুক্তি-প্রয়াসে জীবন দিতে পারি, যদি প্রয়োজন হয়, জীবনের চাইতেই বেশি সেই তোমাকে পর্যন্ত চিরতরে ত্যাগ করতে পারি। (বলার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে উহা কঙ্কণ অঞ্জলিতে গ্রহণ করিল। কংসের সম্মুখে গিয়া) নাও - নাও ঘাতক। (তাহার সম্মুখে অঞ্জলি রাখিল) তৃপ্ত তুমি?

চন্দনা চরিত্রটির দর্পণেই আমরা দেখতে পাই, কংসের অন্তর্দ্বন্দ্বে উথাল-পাথাল হৃদয়ের চিত্রটি। এই চরিত্রটির মধ্যে একদিকে অসহায়তা, অভিমান ও ভালবাসা অপরদিকে জেদ, সাহসিকতা ও ছলনা পাশাপাশি অবস্থান করছে। অথচ শেষ পর্যন্ত নিজের লক্ষ্য, জাতির মুক্তি কামনায় অবিচল থেকেছে চরিত্রটি। কিছুটা বাস্তবোচিত কিছুটা কল্পনায়

মোড়া প্রহেলিকাময় এই চরিত্রটি তাই শুধু কংস নয়, সকলের কাছেই অধরা রয়ে গেল। যাদবের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েও চন্দনার দৃঢ়তায় পাঠক স্তম্ভিত হন।

চন্দনা।। হ্যাঁ, প্রায়শ্চিত্ত করব, ধর্ষিতা হয়েছি বলে নয়, মনুষ্যত্বহীন এই পঙ্কিল পঙ্গু সমাজে জন্মগ্রহণ করেছি বলে। ...আমি চললাম... বিষপান করতে নয়, কিংবা উদ্বন্ধনে তনুত্যাগ করতেও নয়, চললাম সমাজেই আশ্রয় নিতে ... তোমাদের এই অমানুষের সমাজে নয়... মানুষের মত মানুষের সমাজে। (দ্বিতীয় অঙ্ক)

আবার স্বজাতি যাদবদের বিদ্রুপ করে কঙ্কনের উদ্দেশ্যে চন্দনা বলে—

চন্দনা।। শয়তানের সেবা করছি?... কেন করব না? তোমরা কি করেছ? তোমরা এই অত্যাচারের মাঝেও কি মধুপান করছ না? গ্রামে যখন আগুন লেগেছে, তখন কি ঘরে বসে শাস্ত্রচর্চা করছ না? ... বেণু-বীণা নিয়ে জ্যোৎস্না রাতে সঙ্গীতসেবা করছ না? সুকুমার কাব্যচর্চা হচ্ছে... কলা-লক্ষ্মীর কলাপূজা হচ্ছে... প্রেম হচ্ছে... বিবাহ হচ্ছে...। উৎসব... বিলাস... কি বন্ধ হয়েছে? আবার ওদিকে, নারী যখন ধর্ষিতা হচ্ছে... সমাজপতিগণ সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ধর্ষিতা নারীর মনের বল পরীক্ষা করছেন! পতিতা বলে তাকে সমাজচ্যুত করে, সমাজ ধর্ম রক্ষা করতেও তাঁদের কিছুমাত্র ত্রুটি হচ্ছে না— কঙ্কণ আমি করছি দেশদ্রোহিতা, আর এরা করছেন, দেশসেবা, না?

অটল বিশ্বাস, অসম্ভব সহ্যশক্তি এবং নির্বিকল্প ধৈর্যে - শেষ পর্যন্ত এ নাটকের শেষ কথা যেন দেবকীর সংলাপেই পাওয়া যায়—

দেবকী।। (কারা-দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে) তুমি পারবে না। কারাগারে আজ দেশের যত ধর্মাত্মা, যত পুণ্যাত্মা, যত মহাত্মা... কারাগারে আজ ভগবান স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেছেন- কারাগার আজ পুণ্যতীর্থ, কারাগার আজ স্বর্গ। তাই জগতের এই মহাতীর্থে ভগবানের এই স্বর্গে পাতকী তুমি ... তোমার প্রবেশ নিষেধ; শয়তান তুমি বৃথা মাথা খুঁড়ে মরছ। ... কিন্তু কেনই বা এই চেষ্টা..., আমাকে চাও? আমি নিজেই বাহিরে আসছি, ঐ লৌহদ্বার আর আমার পথরোধ করতে পারবে না... আমি আজ ...আমি আজ ...তাঁর জননী যিনি দুষ্কৃতের দমনের জন্য সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে-যুগে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, আমার তপস্যায় এ যুগেও আমারই গর্ভে আজ জন্মগ্রহণ করেছেন—(পঞ্চম অঙ্ক)

নাটকের শেশজ অঙ্কে (পঞ্চম) প্রলয়ঙ্করী, ঝঞ্ঝার বজ্রপাতের মধ্যেই জন্ম নিয়েছেন আর্তের উদ্ধারকর্তা ভগবান। ধ্বংসের মধ্যেই চন্দনার গানের সুরে ঘোষিত হয়ে মহাশক্তিমান সেই দেবতার তাৎপর্যপূর্ণ এই গানটি নাট্যোতাৎপর্য বহন করে—

দুষ্কৃতি বিনাশায় যুগে-যুগে সম্ভব
অধর্ম নিধনে এস অবতার নত
অবিরাম বিমূর্তিত ঐ ওঠে রব—
জাগ্রহি ভগবান, জাগ্রহি ভগবান।

তথ্যসূত্র :

১। চন্দ্র ড. দীপক, বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২৭
২। তদেব, পৃ. ২৮
৩। তদেব, পৃ. ২৯-৩০
৪। ঘোষ ড. অজিত কুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, ২০১০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৩৫০
৫। ঘোষ জয়তী, মন্মথ রায় জীবন ও সৃজন, ২০১০, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ. ২০
৬। বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ, নাট্যনিয়ন্ত্রণ ও বাংলা নাটকের একশ বছর, ১৯৯৫, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, পৃ. ৮৪
৭। তদেব,